চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী ধর্মসম্প্রদায়: শ্যামানন্দ গোষ্ঠী

অসীম বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: মধ্যযুগের যে ক্রান্তিলগ্নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগ ছিল প্রধানত ভক্তিসাধনের যুগ। কবীর, নানক, দাদূ, মীরাবাঈ প্রমুখ সকলেই ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। এঁদের সঙ্গে আরও যে নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে, তিনি হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। এঁরা সকলেই জাতপাতের ভেদাভেদ মানেন নি, মানেননি সামাজিক ও কাঞ্চন কৌলিন্যের গুরুত্ব। সমাজে যারা অবহেলিত ও অন্ত্যেবাসী এবং মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত, এঁরা তাদেরই মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। মধ্যযুগে যখন বাংলা তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে এসেছিল, তখন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল নদিয়ায়। তার বহু পূর্ব থেকেই এই অঞ্চল ধর্মসহিষ্ণু স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তীকালে এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতে এই ধর্মে সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদ প্রবেশ করে এবং অসংখ্য বৈষ্ণবধর্মীয় শাখা-সংগঠন গড়ে ওঠে। যেগুলি পরবর্তী শতকগুলিতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবিত থাকাকালীন সময়েই তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অনৈক্য ও সংঘাত দেখা দিয়েছিল। তাঁর তিরোধানের পর বাংলার বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলা তথা গৌড়ের চৈতন্য ভাবুকরা তখন ছিলেন গৌরপারম্যবাদী। এই সময়ই তাঁর নামে ভক্তিবাদ ও কীর্তন প্রচার করতেন, কিন্তু তাঁরা একত্রিত হয়ে চলতে পারেননি। বড় বড় মহান্তরা নিজ নিজ ভাবতত্ত্ব ও মতাদর্শ নিয়ে চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদকে উপেক্ষা করে পৃথক পৃথক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। ষোড়শ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে গৌড়বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজ নেতৃত্বের অভাবে বিভ্রান্ত, বিমুঢ় ও বিষন্ন হয়ে পড়েছিল। তার কারণ হল- শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের তিরোধান। যাঁদের পবিত্র জীবন কথাকে কেন্দ্র করে বাংলা একটি বিরাট ধর্ম সম্প্রদায় নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সংহতি ও শক্তি অর্জনে উন্মুখ হয়েছিল। এই নেতৃত্ব ত্রয়ীর তিরোধানে এই নব্য সম্প্রদায় ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। আর সেই সুযোগে বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে অসংখ্য গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী, শাখা-উপশাখা, দল-উপদল ও শাখা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই সকল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম সম্প্রদায় হল শ্যামানন্দ প্রভুর নেতৃত্বে শ্যামানন্দ-গোষ্ঠী বা শ্যামানন্দ সম্প্রদায়। আমি আমার এই গবেষণা নিবন্ধে চৈতন্যোত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমান্তরালে গড়ে ওঠা অন্যতম অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্যামানন্দ গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

মূলশব্দ: গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম, উপ-গোষ্ঠী, অনুসারী, শ্যামানন্দ-গোষ্ঠী, গোপীবল্লভপুর, রসিকানন্দ, উৎকল-উড়িষ্যা, রেনেটি, নাচনী, রক্ষাকর্তা।

Society Language and Culture

মূল আলোচনা

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সদগোপ জাতির বৈষ্ণব গুরু শ্যামানন্দ একটি পৃথক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন চৈতন্য-পরবর্তী কালে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব সমাজে। তিনি ভূঁইয়াদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রধানতম শিষ্য রসিকানন্দ রয়ণীর রাজপুত্র ছিলেন। শ্যামানন্দ প্রভু ও রসিকানন্দের শিষ্যদের মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও ছিলেন। এই সম্প্রদায় তাঁদের তত্ত্বে প্রচার করেন যে, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিচার করা যায় না। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে নানা মতবিরোধ দেখা যায়। এভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের শুরুতে এই সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'উনিশ শতকের শেষ দশকেও মেদিনীপুরে এক লক্ষ 'শ্যামানন্দী' বৈষ্ণব ছিলেন।[১] এখানে মুসলিম, কায়স্থ ও অন্যান্য শ্রেণির মানুষ এই মতের অনুসারী ছিলেন। শ্যামানন্দ নিম্নতর সমাজের সদগোপ জাতিকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই তিনি নিম্নবর্ণের মানুষের পতিত উদ্ধারের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্যামানন্দ উৎকলের বাসিন্দা হলেও তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙালি। পণ্ডিত দামোদর, জমিদার, দস্যু, সামন্তগণ সহ শেরখাঁ নামে এক ডাকাতও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উড়িষ্যা-সহ বাংলায় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। নরোত্তম দত্তের আহবানে অনুষ্ঠিত খেতুরি উৎসবেও তিনি সদলবলে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও শ্যামানন্দ অধিকাংশ সময় উড়িষ্যায় চৈতন্যধর্ম প্রচার করেছেন। উৎকলের জমিদার, দস্যু, সামন্তগণ ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শেরখাঁ নামে এক মুসলমান ডাকাতও তাঁর মহিমায় অভিভূত হয়ে দস্যুবৃত্তি ও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গুরুর মহিমা প্রচার করতে থাকেন। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন চৈতন্য দাস বলে। সুবর্ণরেখার কাছে গোপীবল্লভপুরের রাজা প্রসিদ্ধ রসিক মুরারি ক্ষত্রিয় হয়েও সস্ত্রীক শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উড়িষ্যার ও আশেপাশের অঞ্চলের অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণির মধ্যে চৈতন্যধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল শ্যামানন্দের প্রচার কার্যের ফলে। এমনকি কিছুকাল আগেও ময়ূরভঞ্জের রসিক মুরারির শিষ্যদের গুরু বলে মানতেন। চৈতন্য-পরবর্তী কালে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৈষ্ণব ধর্ম কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই শ্যামানন্দ ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা চৈতন্যাদর্শ পুনরায় জনসমাজ ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সুপ্রচার লাভ করেছিল। খেতুরি উৎসবের শ্যামানন্দ অসাধারণ কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন। গুরু ও শিষ্য মিলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মিলনস্থলের খুব কাছে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এক মনোরম স্থানে শ্রীগোপিবল্লভজীউর মন্দির তৈরি করে শ্রীরসিকানন্দের কূলদেবতা রাধাগোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পূজিত বিগ্রহের নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ করেন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর। আজ অবধি গোপীবল্লভপুরে সেই শ্রীগোবিন্দজীউ বিরাজ করছেন। প্রচলিত রয়েছে যে, গোপীবল্লভজীউর মন্দিরে দন্ডমহোৎসব উপলক্ষে দ্বাদশ দিনব্যাপী অধরাত্রি ধরে সুউচ্চ রবে হরিনাম সংকীর্তন হয়। পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের প্রায় দুইশত প্রখ্যাত কীর্তনিয়ার দল আসেন এবং হাজার হাজার ভক্তরা এই মহোৎসবে যোগদান করেন।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে মনোহরসাহী, গরানহাটি, রেনেটি ও মন্দারনী নামে যে চারটি সংকীর্তনের ধারা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে শেষোক্ত দুটি ধারা শ্যামানন্দ প্রভুর এবং রসিকানন্দ প্রভুর দ্বারা প্রবর্তিত। এবং আজ অবধি এই স্থানে এই দুই ধারার কীর্তন গান গাওয়া হয়ে থাকে। গোপীবল্লভপুর জনপদে প্রতিবছর জৈষ্ঠ মাসে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে দন্ডমহোৎসব

Society Language and Culture

অনুষ্ঠিত হয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে, বিশেষত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যে তিনজন মহাপুরুষ রূপানুগশুদ্ধ ভক্তিধারা প্রচারিত করেন তাঁদের মধ্যে শ্যামানন্দ প্রভু অন্যতম ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীনরোত্তম দাসঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভু যথাক্রমে মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম প্রচারার্থে গমন করেন। গৌরাঙ্গ প্রভুর পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুকে যথাক্রমে গৌরাঙ্গ প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের আবেশ অবতার রূপে গণ্য করা হয়। গোপীবল্লভপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশ এই মন্দির ও মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। শ্রাবণী পূর্ণিমার সময় এই স্থানে একটি বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপলক্ষে নানাস্থানের বহু সংখ্যক বৈষ্ণবের সমাবেশ ঘটে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের এবং উড়িষ্যার নানাস্থানেই গোপীবল্লভপুরের গোবিন্দজীউর সম্পত্তি আছে এবং গোস্বামী বংশের শিষ্য আছে। আসলে শ্যামানন্দ প্রভু মেদিনীপুর-সহ উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন বাংলায় চৈতন্য-পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে তাঁর নিজের নামে একটি অনুসারী বৈষ্ণব গোষ্ঠী গড়ে তুলে তার নবরূপ দান করেন।

শ্যামানন্দ প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন ১৫৫৬ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন আনুমানিক ১৫৫২ শকাব্দে বা ১৬৩০ সালে। তিনি নরোত্তম দত্ত ও শ্রীনিবাস আচার্যের চেয়ে সম্ভবত বয়সের দিক থেকে কনিষ্ঠ ছিলেন। 'রসিক মঙ্গল' থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল এবং মাতার নাম দূরিকা দেবী। এঁদের আদি নিবাস ছিল গৌড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল গৌড় থেকে এসে বর্তমানকালের খড়গপুর থানার অন্তর্গত ধারেন্দা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং এই ধারেন্দাতেই শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।। মতান্তরে, কৃষ্ণ মণ্ডলের আদি নিবাস ছিল কলাইকুন্ডার কাছে ধারেন্ডা গ্রামে। যেখান থেকে এঁরা চলে আসেন দণ্ডেশ্বরে। এই দণ্ডেশ্বরেই শ্যামানন্দের জন্ম হয়।[৩] তবে শ্যামানন্দের জন্ম ধারেন্দা গ্রামে বলেই সাধারণভাবে স্বীকৃত।

শ্যামানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল জাতিতে ছিলেন সদগোপ। কৃষিকাজই ছিল তাঁর মূল জীবিকা। শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাই শ্যামানন্দ যাতে যথাযথ শিক্ষা লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যাই হোক, শ্যামানন্দের বাল্যকালের নাম ছিল দুঃখিয়া। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্যামানন্দের নামকরণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

"গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার।
এখন দুঃখিয়া নাম রহুক ইহার।।
মাতাপিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখীনাম প্রথমে হৈল"।[৪]

পরে দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু কৃষ্ণদাস নাম রেখেছিলেন এবং সেই দিন থেকে দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁর নামকরণ হয় শ্যামানন্দ।

যৌবনকালই শ্যামানন্দের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল। ধারেন্দায় তখন কিছু সংখ্যক বৈষ্ণব বসবাস করতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকেই মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। শ্রীচৈতন্য যখন মেদিনীপুর হয়ে উড়িষ্যা যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এক রাত্রি খড়্গপুরে বসবাস করেছিলেন।[৫] তারপর তিনি গোপীবল্লভপুর জনপদ হয়ে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর বৈষ্ণব জগতে

Society Language and Culture

তিন প্রভুর আবির্ভাব হয়। মধ্যবঙ্গে নেতৃত্ব দেন শ্রীনিবাস আচার্য। উত্তরবঙ্গে নেতৃত্ব দেন নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং উৎকল ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে নেতৃত্ব দেন শ্যামানন্দ প্রভু। যৌবনকালে শ্যামানন্দ বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই কারণে, তিনি পিতা-মাতা কর্তৃক কিছু গ্রামবাসীর সঙ্গে বর্ধমানের কালনায় চলে আসেন। কালনাতে দুখিয়া কৃষ্ণদাসকে গৌড়ীয় পণ্ডিতের প্রভাবশালী গুরু হৃদয়চৈতন্য বা হৃদয়ানন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। হৃদয় চৈতন্য তাঁকে **'শ্যামানন্দ'** উপাধিতে ভূষিত করেন।[৫ক] কালনার বৈষ্ণব নেতার শিষ্য হওয়ায় তিনি নিত্যানন্দ গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে গুরুর কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে ধর্মীয় তথ্যসমূহ ও আচার-আচরণ শিক্ষার জন্য বৃন্দাবনে প্রেরিত হন। অতঃপর তিনি নিজ নামেই পরিচিত হন এবং পৃথক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

বৃন্দাবনে গিয়ে শ্যামানন্দ ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্য হন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে রাধা ও কৃষ্ণের নাম জপের পঞ্চমন্ত্র দান করেন। পরবর্তীতে হঠাৎ করে একটি গুজব রটে যায় যে, জীব গোস্বামী প্রথা ভেঙে শ্যামানন্দের দ্বিতীয় গুরু হন। ঘটনাটি বৈষ্ণববিরোধী। এই ঘটনায় বৈষ্ণব জগতে সাড়া পড়ে যায়। শ্যামানন্দের প্রথম গুরু হৃদয় চৈতন্য এবং আরো ৬৪ জন মহান্ত জীব গোস্বামীর এই আচরণের গভীর সমালোচনা করেন। খুব সম্ভবত জীব গোস্বামী শ্যামানন্দের শিক্ষাগুরু হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য হৃদয় চৈতন্য শ্যামানন্দের এই কাজকে স্বহৃদয়চিত্তে স্বীকার করে নেন। বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ আকাঙ্ক্ষিত **'অধ্যাপক'** উপাধিতে ভূষিত হলেন। তিনি রাধার হারানো নূপুরের পুনরুদ্ধার করে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন। এরপর থেকেই তিনি ও তাঁর অনুগামীরা যারা **'শ্যামানন্দ গোষ্ঠী'** নামে পরিচিতি লাভ করলেন, তাঁরা কপালে নূপুর চিহ্নের মতো তিলক ধারণ করতেন। যা অন্যান্য বৈষ্ণব গোষ্ঠী থেকে পৃথক ছিল এবং তাঁদের অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে রেখেছিল।[৬] তিলক সেবার ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুসারী শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা কপালে নূপুর চিহ্নের আকারে যে তিলক পরিধান করত, তা বর্তমানেও তাদেরকে অন্যান্য বৈষ্ণবগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে রেখেছে। বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দত্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, ভূগরভ গোস্বামী এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গভীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। অতঃপর শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য ও নরত্তম দাস ঠাকুর-সহ অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলায় প্রত্যাগমন করেন প্রচুর বৈষ্ণব পুঁথি নিয়ে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়ে যখন ফিরছিলেন তখন বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের অনুচরবর্গ কর্তৃক ঐ সকল পুঁথি লুণ্ঠিত হয়। এরপর শ্রীনিবাস আচার্যের নির্দেশে তিনি নরোত্তম-সহ কালনা যাত্রা করেন এবং হৃদয় চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধারেন্দায় প্রত্যাগনের পূর্বে, শ্যামানন্দ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর, পুরী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। ধারেন্দা থেকে পুনরায় তিনি বৃন্দাবন গমন করেন জীব গোস্বামীর গ্রন্থ 'গোপালচম্পু' ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করার জন্য। সেখানে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। জীব গোস্বামী তাঁদের তিনজনকে উৎকলে, গৌড়দেশে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। গুরুর আদেশ মতো শ্যামানন্দ মেদিনীপুরে এসে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি বার্নপুরে (বেনাপুর), পঞ্চটি (পাঁচেট), নারায়ণগড়, মোহনগড় (মোহনপুর) প্রভৃতির স্থানের শত-শত ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই সময় শ্যামানন্দ রচনা করেন একে একে 'অদ্বৈততত্ত্ব', 'উপাসনা সংগ্রহ', 'বৃন্দাবন পরিক্রমা' নামক গ্রন্থ তিনটি।[৭]

Society Language and Culture

তিনি অসংখ্য পদ রচনা করে তাঁর নিজের জীবন বৃত্তান্ত এবং রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রসঘন তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। ভনিতার মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। এইরূপ একটি পদ হল-

'সুরঙ্গ পাগ শিরে/ টেড়ি লোভে/ বাঁকে নয়ন বিশাল।
তা পরে ময়ূর/ চন্দ্রিকা বিরাজে/ রত্ন কি পেচ রসাল'।।

রাধার বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য আরেকটি পদে-

'ঘুঙ্গুরওয়ালি/ অলকে ঝলকে/ উরে মোতিয়নকি মাল'।

এর ভাষা এবং বর্ণনা দুটি ইসলামি বেশভূষার সংস্পর্শজাত এমন মনে হওয়া অসম্ভব নয়। এই ধরনের বেশভূষায় সম্মানিত কৃষ্ণকথা মূলক চিত্রকলা থেকেও এমন অনুমান সহজেই করতে পারা যায়। অর্থাৎ, শ্যামানন্দ হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষাকে তাঁর বৈষ্ণবচর্চা ও পদ রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

চৈতন্য-পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক হিসাবে শ্যামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর চেষ্টায় উৎকল বা উড়িষ্যার অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গোপিজনবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গল' নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকরে' ও কৃষ্ণচরণ দাসের 'শ্যামানন্দ প্রকাশে' তাঁর ধর্ম প্রচারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। চৈতন্য-পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে যে পৃথক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী ধর্ম হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ও উড়িষ্যায় তা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

শ্যামানন্দ প্রভু মেদিনীপুরের খড়গপুর এর কাছে ধারেন্দার সন্নিকটে বাহাদুরপুর নিকটবর্তী নৃসিংহপুরে তাঁর স্থায়ী প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন এবং সেখান থেকেই বৈষ্ণব আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের যেসব অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- আলমগঞ্জ, বলরামপুর, বগড়ী, বড়কোলা, বড়গ্রাম, বসন্তপুর, বানপুর, ভঞ্জভূম-রাজগড়, ভোগরাই, চাকুলিয়া, ধারেন্দা-বাহাদুরপুর, ফতেপুর, গোপীবল্লভপুর, ঘাটশিলা, হরিহরপুর, হিজলি, ঝাটিয়াড়া, কাশিপুর, কেশিয়াড়ী, কেওনঝড়, ময়না, ময়ূরভঞ্জ, মুক্তারপুর, নৃসিংহপুর, রয়ণী, রঘুনাথপুর, রানিহাটি, বালাশোরের রেমুনা, শ্যামসুন্দরপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি। এর মধ্যে বানপুরে এখনো শ্যামানন্দের মূর্তি পূজা প্রচলিত আছে। এখানে শ্যামানন্দকে বৈষ্ণব ধর্মের "বৈষ্ণবকুলশিরোমনি" বিবেচনা করে তাঁর মূর্তির পূজা করা হয়।[৮]

শিষ্য পরম্পরায় বৈষ্ণবধর্ম বিস্তৃত ও প্রসারিত হতে থাকে শ্যামানন্দ প্রভুর সমকালীন সময়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গৌড়ীয় দর্শন বা চৈতন্য মহাপ্রভুর আধ্যাত্ম্যদর্শনকে সামনে রেখে তাঁকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পরিকরগণ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে চৈতন্যের মৃত্যুর পরবর্তীকালে চৈতন্য ধর্ম এবং তাঁর আধ্যাত্ম্যদর্শন একটি প্রতীকে পরিণত হয় মাত্র। তাঁকে বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করা হয় মাত্র। বাস্তবে চৈতন্য পরবর্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্তরালে এবং সমান্তরালে অসংখ্য গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীগুলি মূলত বিশেষ নেতা বা তীর্থকেন্দ্র বা শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে চৈতন্য পরবর্তী কালে মূলধারার গৌড়ীয় চিন্তাদর্শন পরবর্তীকালের ধর্ম প্রচারকদের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য ছিল না, বরং চৈতন্যকে তাঁরা প্রতীক বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেই তাঁদের নিজেদের মতো করে স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম পরিচালনা করতে থাকেন। এর ফলে

Society Language and Culture

বৈষ্ণবীয় চিন্তা জগতে ঐক্যের মনোভাব দূরীভূত হয় এবং একক নেতৃত্বের স্থান সর্বাগ্রে উঠে আসে। সুতরাং তাই দেখা যাচ্ছে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের চিন্তা চেতনার থেকে তীর্থকেন্দ্র ভিত্তিক ব্যক্তিগত বৈষ্ণব চেতনা এই সময় প্রকট হয়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। আর এর ফলে বৈষ্ণব ধর্মের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং তার স্থান দখল করে নেয় বিভিন্ন নেতা ও বাবাজিরা। তাদের হাতে বৈষ্ণব ধর্মের অখন্ড চিন্তাধারা কিছুটা হলেও বিলুপ্ত হয় এবং আঞ্চলিক স্তরে বৈষ্ণব ধর্মের শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তারা নিজেদের মতো করে ধর্ম পরিচালনা করতে থাকেন।

শ্যামানন্দ প্রভুর প্রথম ও প্রধান শিষ্য ছিলেন ডুলুং ও সুবর্ণরেখা নদীর সংযোগস্থলেল সন্নিকটের অবস্তিত রোহিণীর রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিক মুরারি। রসিক মুরারি বা রসিকানন্দই শ্যামানন্দের বৈষ্ণব আন্দোলনকে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। যদিও এই সময় রসিক মুরারি নামে দুজন ব্যক্তি ছিলেন, যার মধ্যে শ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারিই ছিলেন উল্লেখযোগ্য। রসিকানন্দের স্ত্রীর নাম মালতী দেবী। অপরদিকে মুরারির স্ত্রীর নাম শচীরানী। শ্যামানন্দের অন্য শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন দামোদর যোগী ও পাঠান শাসক শেরখাঁ। মুসলমান শাসক শেরখাঁ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে রসিকানন্দ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানের শত শত জনগণকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব উৎসব পালন করতে সক্ষম হন। এবং তাঁরই মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হয়। যেহেতু স্থানীয় শাসক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাই জনগণও শাসকের পথ অনুসরণ করে সহজেই এই ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এর পাশাপাশি শ্যামানন্দ প্রভুর আরো কয়েকজন শিষ্য বিভিন্ন অঞ্চলে খুবই প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, তিনি হলেন ফতেপুর গ্রামের বাসিন্দা ভজন অধিকারী।[৯] ভজন অধিকারী নিজ প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্মকে বর্তমান কাঁথি ও কেশিয়াড়িতে প্রচারিত ও প্রসারিত করেছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যের উল্লেখ আছে। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে ৩১ জন শিষ্যের কথা উল্লিখিত আছে। আবার 'রসিক মঞ্জুরী' গ্রন্থে রসিক মুরারির ২০৩ জন শিষ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফলে এই অঞ্চলে তাঁদের ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে খুব কম পরিমাণ বাধা এসেছিল।[১০]

উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের একটি বড় মাধ্যম ছিল। তাই রসিকানন্দ মেদিনীপুরে বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। আলমগঞ্জে দ্বিতীয় বৈষ্ণব উৎসবটি স্থানীয় মুসলমান শাসকের অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গোপীবল্লভপুরে তিনি মহারাসযাত্রা বিপুল উৎসাহে পালন করতেন এবং এখনও তা পালিত হয়ে থাকে। এখানে তিনি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের জীবিত শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন। এর ফলে বৈষ্ণব জগতে শান্তিপুর গোষ্ঠী এবং শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপোড়েন চলতে থাকে। অচিরেই শান্তিপুর গোষ্ঠী ও শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ শুরু হয়। এই উৎসবগুলির মাধ্যমে শ্যামানন্দ ও রসিক মুরারি বহু ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। এ বিষয়ে একটি কথা স্মরণ রাখা জরুরি, তা হল বৈষ্ণবদের খেতুরি উৎসবের বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানীয় ভূস্বামীদের রাজকোষ থেকেই আসত। আর এই অর্থের কিছু অংশ শ্যামানন্দ প্রভু তাঁর শ্রীপাট এলাকা থেকে আদায় করে এই উৎসবে অনুদান হিসাবে দিয়েছিলেন।

Society Language and Culture

অল্পদিনের মধ্যেই গৌড় এবং রাঢ়বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেদিনীপুরের শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণবদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। বিবাদের কারণ সম্ভবত বৈষ্ণব ধর্মের নেতৃত্ব এবং ভঞ্জভূম, বরাহভূম, শিখরভূম ইত্যাদি অঞ্চলের উপর আধিপত্য সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে। রসিকমঙ্গলে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের কিংবা বৃন্দাবনের কোনো গোস্বামীর কথা উল্লেখিত হয়নি। এমনকি, শ্রীনিবাস আচার্য এবং নরোত্তম ঠাকুরের নাম ও রসিক মঙ্গলের 'বন্দনা' অংশে উল্লেখিত হয়নি।[১১] অন্যদিকে, 'প্রেমবিলাসে' মেদিনীপুর বৈষ্ণব আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্ররূপে উল্লেখিত হয়নি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতৃত্বের সঙ্গে মেদিনীপুরের শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণবদের বিরোধ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল বলে কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থে মূলধারার বৈষ্ণব ধর্মের কোনও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, চৈতন্যের মৃত্যুর পর যে বৈষ্ণব ধর্মে ফাটল ধরেছিল এবং নেতৃত্ব ও ধর্মের আচার বিচারগত বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরোধ-সংঘর্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা উল্লেখিত ঘটনা দু'টির প্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়। মেদিনীপুরের বৈষ্ণব আন্দোলনের উল্লেখ মূলধারার বৈষ্ণবীয় আন্দোলন স্বীকার না করলেও খেতুরি এবং বিষ্ণুপুরের ওপর তাঁরা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যে ষোড়শ শতকের পর থেকে ভাঙতে শুরু করেছিল তার প্রমাণ মেলে। যাই হোক, শ্যামানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্যদের মধ্যে গভীর একতা ছিল। তবে তাঁর মৃত্যুর পর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবাদ। এমনকি তাঁর তিন স্ত্রী তাঁর 'গদী' বা নেতৃত্ব পদ নিয়ে বিবাদ শুরু করেছিলেন।[১২]

শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করা। তিনি রোহিণীর রাজা অচ্যুত্যানন্দকে, ঘাটশিলার জমিদারকে, গোবিন্দপুরের জমিদার ভীমধন ভূঁইয়াকে, বগড়ীর জমিদার রাজ্যধর রায়কে, পাঠান শাসক শের খানকে বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষিত করেছিলেন।[১৩] ধারেন্দার অত্যাচারী দুই ভূঁইয়া বা জমিদার ভীম ও শ্রীকরকে শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিক মুরারি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। মেদিনীপুরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায় শ্যামানন্দ ও তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষে মেদিনীপুরের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করা সহজ হয়। রসিক মুরারি ময়ূরভঞ্জের শাসক বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা গজপতি, পাঁচেতের রাজা হরিনারায়ণ, ময়নার রাজা ভানুচন্দ্র, উড়িষ্যার সুবাদার ইব্রাহিম বেগের ভাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।[১৩ক] অসংখ্য মানুষ, জমিদার থেকে সাধারণ মানুষ এই সময় শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রচারক রসিক মুরারির সংস্পর্শে আসেন এবং বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে এই অঞ্চলে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে যোগ্য নেতৃত্বের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রসিক মুরারি বঙ্গদেশের সুবাদারকে কুড়িটি হস্তি উপহার দিয়েছিলেন। এই অসামান্য দানে সুবাদার খুবই মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্যামানন্দের বৈষ্ণব আন্দোলনের আর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এসময়ে মেদিনীপুর জেলার কোনও কোনও অঞ্চলে নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণব ধর্ম বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এদের সহাবস্থান খুবই বিস্ময়কর। গরবেতার পুরুষোত্তম দাসের একজন বংশধর কানু ঠাকুরের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল শ্যামানন্দ যুগে। রামদাস অভিরামের বৈষ্ণব ধর্ম ঘাটাল মহকুমায় বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। শ্যামানন্দের মৃত্যুর পরে রসিক মুরারি এই বৈষ্ণব গোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, বৈষ্ণব নেতা ও বৈষ্ণব গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হতে পেরেছিল।[১৪]

Society Language and Culture

রসিকাকানন্দ অন্যন্য বৈষ্ণব নেতাদের মধ্যে জনগণকে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রাজ-শাসকের পুত্র। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে রাজভাবের পরিবর্তে ধর্মনৈতিক দিক পরিলক্ষিত হয়েছিল। স্বভাবত:ই শাসক সম্প্রদায়ের সমর্থন বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্যামানন্দের বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুর এবং ওড়িশায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। এত ব্যাপক সংখ্যক লোক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যে মেদিনীপুরের বৈষ্ণবগণ একটি অন্যতম গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। যে গোষ্ঠীটি অবশ্যই শ্যামানন্দ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু ও গোস্বামীগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণদের মতো শক্তিশালী হয়ে নানান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। মেদিনীপুর ও বালাসোরের কায়স্তরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে তাদের জাতিগত মর্যাদা বৃদ্ধি করে।[১৫] অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু ও গোস্বামীরা তাঁদের অনেকেই আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করে ব্রাহ্মণদের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' থেকে জানা যায়, শ্যামানন্দ প্রভু উপবীত ধারণ করতেন।[১৬] উপবীত ধারণ করে তিনি নিজেকে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ বলে মনে করতেন। শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতার মূল কারণ জমিদারদের কাছ থেকে বৈষ্ণবত্বের জমির নিষ্কর স্বত্ব লাভ। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে মেদিনীপুরের শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর বৈষ্ণবের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। উইলিয়াম হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৭২ সালে মেদিনীপুরে বৈষ্ণব জাতির লোকসংখ্যা ছিল ৯৬,১৭৮ জন। কিন্তু ১৯০১ সালে এই জাতির সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৯২,৬৯৮ জনে।[১৭] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা হ্রাসের সম্ভাব্য কারণ হল- ১) মেদিনীপুরের শ্যামানন্দ বৈষ্ণব শাখার মধ্যে ব্যাপক অন্তর্কলহ শুরু হয়ে যায় উনিশ শতকের শেষ দিকে। ২) বাহাদুরপুর ধারেন্দাসহ মেদিনীপুরে অন্যান্য অঞ্চলে জমিদারদের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। যার ফলে বৈষ্ণবদের সংখ্যা কমতে থাকে। এ বিষয়ে আরেকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, যেহেতু শ্যামানন্দ ও রসিক মুরারি দুজনেই বিবাহিত ছিলেন, সেহেতু তারা মূলত গৃহীভক্তদের কথা বলেছেন। গৃহীরাই অধিক পরিমাণে এদের ভক্ত হতে পারতেন। অসংখ্য পরিমাণে গৃহহীন মানুষরা এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে বৈষ্ণবদের সংখ্যা দিন দিন কমে যেতে থাকে। এর পাশাপাশি সামন্ত প্রভুদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ বৈষয়িক স্বার্থ সম্বলিত ছিল। সামন্ত প্রভুদের সমর্থন ও সাহায্য পাওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম বিস্তৃত হতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে ধর্মক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনেরও চাহিদা সামন্ত প্রভুদের কাছ থেকে মেটানো হত। অন্যদিকে সামন্ত প্রভুদেরও উপকার হয়েছিল। স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ের শান্ত প্রকৃতির হয়ে উঠতে থাকে। জমিদারদের নিশ্চিত শাসনের সুযোগ আসে। কারণ বিদ্রোহ বা বিপ্লব করার পথ এর ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে আরেকটি দিক লক্ষ্য করা যায়; শ্যামানন্দ ও রসিক মুরারির বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংখ্যায়, গুণগত উৎকর্ষে নয়। সেই জন্য তাঁদের শিষ্যদের সংখ্যা প্রচুর হলেও গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির মতো কোনো পদকর্তা শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর আন্দোলনের মধ্য থেকে জন্ম লাভ করেননি। একমাত্র গোপীজনবল্লভ দাস এবং শ্যামানন্দ যা কিছু রচনা করেছেন, তার বাইরে সেভাবে কিছু চোখে পড়ে না।

শ্যামানন্দ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুর জেলায় এক বিশেষ কীর্তন গানের রীতি প্রচলিত হয়েছিল, যা **'রেনেটি'** কীর্তন ঘরানা রূপে জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই রেনিটি কীর্তন

Society Language and Culture

ঘরানার সাথে হিন্দুস্থানের ঠুংরি গানের বিশেষ মিল লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় কীর্তনকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন বেণীদাস নামে এক কীর্তন গায়িকা।[১৮] তাছাড়া, বরাভূমির উপজাতি সংস্কৃতির ওপর বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায় স্থানীয় উপজাতি কর্তৃক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণের পূজার মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও বিরহের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় উপজাতিদের দেহতত্ত্ব ঝুমুর, ধূয়া, খ্যাপার এবং নাচনী শৈলীর মধ্যে। **'নাচনী শৈলী'** হল এক ধরনের উপজাতি কীর্তন যা বাংলা ও ব্রজভাষায় একটি কৌতুহলোদ্দীপক সংমিশ্রণ সম্বলিত গায়ন রীতি। স্থানীয় শাসকরা এই কীর্তনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর মূল বিষয় ছিল রাধা-কৃষ্ণের অবৈধ যৌন সম্পর্ক। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সাঁওতাল ঝুমুর গানের মধ্যে অবিসংবাদিত বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক হীনমান্যতা থেকে তারা কিছুটা নিষ্কৃতি পায়। রসিক মুরারি ও শ্যামানন্দকে উপজাতিরা তাদের **'রক্ষাকর্তা'** বলে মনে করে।[১৯]

শ্যামানন্দ ও রসিক মুরারির ব্যাপক ধর্ম প্রচার ও প্রসারের আরেকটি ফল হল মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণবোত্তর জমিতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। এই মন্দিরগুলি বঙ্গদেশের চিরাচরিত রীতিতে কোনো ব্যতিক্রম আনতে পারেনি। শিখর, চালা, রচনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুকরণে এই গোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একশোটি বৈষ্ণব মন্দির দেখা যায়।[২০] এ সমস্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, জেলায় একসময় বৈষ্ণব ধর্ম একটি প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল এবং যার মূল হোতা ছিলেন শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ।

বৈষ্ণব গোষ্ঠী হিসাবে শ্যামানন্দ গোষ্ঠীর প্রভাব মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এই গোষ্ঠীর আন্দোলনের ফলে এই বৃহৎ অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপযোগী একটি সহনশীল মনোভাব ও পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। সেজন্য দেখা যায়- বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও শান্তিতে বসবাস করছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, ধর্ম ঠাকুরের অনুরাগীরাও ঘাটাল ও তমলুক মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে তাদের কোনও অসুবিধা হয়নি। কর্ণগড়, মেদিনীপুর শহর ও চন্দ্রকোণায় শাক্ত ধর্মের প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বৈষ্ণব-শাক্তদের মধ্যে সহজ মিলনের সুর বিভিন্ন কাব্য ও রচনাতে দেখতে পাওয়া যায়। রামেশ্বর চক্রবর্তী তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে এমন প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এই কাব্যে চৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু ও আরো কয়েকজন বৈষ্ণব গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।[২১] সর্বোপরি, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলে বৈষ্ণব মরমী কবি-সাহিত্যিক ও মুসলমান কবিদের মধ্যে একটি সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, চৈতন্যোত্তর কালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে অনুসারী বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে শ্যামানন্দ গোষ্ঠী অন্যতম। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মত এই গোষ্ঠীটিও শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রতীক বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর আধ্যাত্মদর্শন ততটা গ্রহণ না করে স্বতন্ত্রভাবে নিজ ধর্ম পালন করেছেন এবং প্রচার ও প্রসার কার্যসম্পন্ন করেছেন।

Society Language and Culture

তথ্যসূত্র

১. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ.১০৫।

২. মুরারি, রসিকানন্দ, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দচরিতম্, বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত টীকা সহ, শ্রীহরিদাস দাস(সম্পা.), নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ, নদিয়া, ১৩৪৪, পৃ.১২৭-১২৮।

৩. দাস, বসন্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ.২৬।

৪. চক্রবর্তী, নরহরি বা ঘনশ্যাম দাস, ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ, পদ: ২৫৯, ৩৫৮।

৫. পাল, ত্রৈলোক্যনাথ, মেদিনীপুর ইতিহাস, ৪র্থ সং, কলকাতা, ১৮৯৭, পৃ.৭০-৭২।

৫ক. ভৌমিক, শ্যামাপদ, খড়গপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম খন্ড, ক্রান্তিক প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ.৩০।

৬. ব্রহ্মচারী, শ্রীতারক ব্রহ্ম দাস, শ্রীশ্রীগৌড়দেশে তিন আচার্য, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, ১ম সং, ৫২৮ গৌরাব্দ, ২০১৫, পৃ.৩৮৭-৩৯১।

৭. দাস, বসন্ত, প্রাগুক্ত।

৮. Chakraborty, Ramakanta, Vaisnavism in Bengal,1486-1900, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1985, pp.253-254.

৯. ভৌমিক, শ্যামাপদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩।

১০. Chakraborty, Ramakanta, op.cit., p.251.

১১. বসু, যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড একত্রে, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৪১৬, পৃ.৪৫৬-৪৬২।

১২. দাস, গোপীজনবল্লভ, রসিকমঙ্গল, তমলুক সং, মেদিনীপুর, উত্তরা, ৪, পৃ.১৫৪।

১৩. দাস, নিত্যানন্দ, প্রেমবিলাস, মৃণালকান্তি ঘোষ(সম্পা.), বহরমপুর সং, ১২৯৯, পৃ.৩০৪-৩০৫।

১৩ক. ভৌমিক, শ্যামাপদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪।

১৪. Chakraborty, Ramakanta, op.cit.

১৫. Malley, L.S.S.O., Bengal District Gazetteers, Midnapore, Calcutta, 1911, pp.64-66.

১৬. দাস, নিত্যানন্দ, প্রাগুক্ত।

১৭. Census Report on the Bengal, Census of India, 1901, Vol. VIB, Part-III, p.69.

১৮. Chakraborty, Ramakanta, op.cit., p.255.

১৯. loc.cit. p.253.

২০. সেনগুপ্ত, কান্তিপ্রসন্ন, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস-মধ্যযুগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭, পৃ.১২৪

২১. ভৌমিক, শ্যামাপদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬-৩৭।

Society Language and Culture